3/27

★ কংগ্রেসী সরকারের ব্যয় সংকোচ ★

রাষ্ট্রপতির প্রতি মিনিট বক্তৃতার জন্য এক হাজার করে টাকা খরচ

● *এই বছরের দ্বিতীয় তিনমাসে মোট ৩,৪২,২৮৪ জন বেকারও চাকরীপ্রার্থী* ●

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা | সোমবার, ১লা জানুয়ারী ১৯৫১, ১৬ই পৌষ, ১৩৫৭ | মূল্য—দুই আনা

নেতাদের স্বাধীনতা আসার আগে অনেক বড় বড় কথা শোনা গিয়েছিল দেশের বেকার সমস্যা নিয়ে। পণ্ডিত জওহর লাল বলেছিলেন দেশের বেকার সমস্যার সমাধান যে কোন রকমেই করতে হবে। এই সেদিন ভারতবর্ষের গঠনতন্ত্র গৃহীত হবার সময় ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল, প্রত্যেকটি দেশবাসীর কাজের অধিকার থাকবে। ধনবাদী দেশে জনসাধারণের প্রতিটি অধিকার যেমন শুধু কাগজেই লেখা থাকে বাস্তবে দেখা যায় না, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অবশ্য এ অবস্থা ধনতন্ত্রে না হয়ে পারে না। ধনতন্ত্রের উদ্দেশ্য পুঁজিপতি শ্রেনীর মুনাফা, সেই উদ্দেশ্য বজায় রাখতে হলে দেশে বিরাট এক বেকারের দল বাঁচিয়ে রাখতে হয়, কারণ তা করতে পারলে যৎসামান্য কম মজুরীতে মজুর পাওয়া যায় এবং শ্রমিকদের চূড়ান্ত শোষণ করে মুনাফার পাহাড় গোড়ে তোলা যায়। এই জন্যই ধনবাদী দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশে বেকার সমস্যা চিরকাল ধরে থাকে। যুদ্ধের পর এই সমস্যা আরও তীব্ররূপ ধারণ করেছে ধনতান্ত্রিক সংকট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

আগেকার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কংগ্রেসী নেতারা বলেন দেশকে শিল্পোন্নত করা সম্ভব হচ্ছে না; তাই দেশের লোককে কাজ দেওয়া সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের মত শিল্পবিষয়ে পিছিয়ে পড়া দেশের বেকার সমস্যা সমাধান করতে যথেষ্ট দিন সময় লাগবে এ কথাগুলির একটাও খাটে না। প্রথমত শিল্পোন্নত হলেও ধনবাদী দেশে বেকারত্ব ঘোচান যায় না। গেলে ধনবাদ আর ধনবাদ থাকত না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মার্কিন শিল্প বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রসর অথচ সেখানেও চূড়ান্ত বেকার সমস্যা। লাখ লাখ লোক পূর্ণ বেকার, আর আংশিক বেকারদের কথা না বলাই ভাল। তাদের সংখ্যা কোটি পার হয়ে গিয়ে আরও বহু লাখে পৌঁছেচে। দ্বিতীয়তঃ দেশের অর্থনীতিকে প্রকৃত অর্থে দেশবাসীর স্বার্থে পরিচালিত করলে পিছিয়ে পড়া দেশেও যে কেউ বেকার থাকে না তার প্রমাণ হল ইউরোপের নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলি, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশগুলি শিল্প বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে সেখানে যা শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল তাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তবুও নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম হবার চার বছরের মধ্যে সে সব দেশ থেকে বেকার কথাটাই উঠে গিয়েছে। আজ সেখানে একজনও বেকার লোক নেই; প্রতি বছর বরং সেখানে শ্রমনিযুক্ত লোকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে।

ভারতবর্ষের বেলায় বেকারের সংখ্যা কমবার বদলে প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশে প্রকৃত সংখ্যা জানবার কোন ব্যবস্থা নেই। বেকারত্বের কিছুটা পরিচয় মেলে বড় বড় সহরে যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আছে তাদের হিসাব থেকে। এই বছরের দ্বিতীয় তিনমাসেই ৩, ৪২, ২৮৪ জন লোক চাকুরীর জন্য আবেদন জানিয়েছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে। প্রকৃত সংখ্যা যে এর কতগুণ তা বলা যায় না। দেশকে শিল্পোন্নত করলে এবং জাতীয় অর্থনীতি—জনা কয়েক কোটি পতিদের স্বার্থে পরিচালিত না করে দেশবাসীর স্বার্থে করলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু শিল্পের উন্নতির কথা বললেই নেতারা অজুহাত দেন—টাকার অভাব। অথচ বাস্তবে টাকার অভাব নেই, অন্যখাতে মোটা মোটা টাকা খরচ করা হচ্ছে। যে দেশের লোক দুবেলা পেট পুরে খেতে পায় না সে দেশের সামরিক খাতে মোট রাজস্বের শতকরা ৬০ ভাগ এবং শিল্প বিষয়ে শতকরা ২ ভাগ ব্যয় ইচ্ছাকৃত অপরাধ। শুধু তাই নয়, অন্যান্য বিষয়েও মোটা মোটা টাকা ওড়ান হচ্ছে। গত অক্টোবরের শেষদিনে রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতায় যে বক্তৃতা দেন তার জন্যই শুধু খরচ করা হয় ২০,৮৯৩ টাকা। তিনি প্রায় কুড়ি মিনিট বক্তৃতা করেছিলেন। তাহলে প্রতি মিনিট বক্তৃতার জন্য এক হাজার করে টাকা ব্যয়। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে সরকারী টাকা এইভাবে তছ্‌নচ করা হয়। তাছাড়া মন্দির গোড়তে ২ লাখ টাকা, চাপরাসি, আর্দালির উর্দির জন্য কয়েক লাখ টাকা এবং এই ধরনের আরও কত আছে। গরীব ভারতবাসীর পক্ষে এই জাতের শ্বেত হস্তি পোষা অসম্ভব।

কংগ্রেসী রাজত্বের এই হ'ল নমুনা, একদিকে জনতার দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি অন্য দিকে নেতাদের পকেট ভর্তি। মুখে অবশ্য Plain living and high thinking এর বুকনি থাকবে। সেটা হল গান্ধীয় মুষ্টিযোগ।

ভারতীয় অর্থনীতির ধারা

দ্রুতগতিতে পুঁজির একেন্দ্রীকরণ ১০টি পরিবারের হাতে অর্থ-নৈতিক জীবনের শাসন

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বনিয়াদ এমনভাবে গড়া হয়েছে যে তাতে ধনী এবং দরিদ্র প্রতিটি লোকের স্বার্থ রক্ষিত হবে ন্যায়সঙ্গতভাবে; তাই প্রত্যেক ভারতবাসীর উচিত সেই ব্যবস্থার সহিত সহযোগিতা করে ভারতবর্ষে ওয়েলফেয়ার ষ্টেট প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করা। এই কথা অনেক দিন থেকেই বলে আসছেন কংগ্রেসী নেতৃবর্গ এবং সরকারী বিচারে ভারতের শ্রেষ্ঠ সব ধুরন্ধর অর্থনীতিবিদরা। এই কথার সম্প্রতি পুণরাবৃত্তি করেছেন এক নাম করা বৈজ্ঞানিক রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতায়। কোন রাষ্ট্রকে সত্যিকারের জনস্বার্থ রক্ষাকারী রাষ্ট্র হতে হলে তার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান সর্ত্ত হল—সেই দেশের অর্থনীতি হতে কায়েমী স্বার্থের বিলোপ এবং প্রকৃত জাতীয় অর্থে অর্থাৎ দেশবাসীর স্বার্থের উদ্দেশ্যে অর্থনীতিকে পরিচালিত করা। একচেটে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিশ্চিৎ ক্রমপরিণতি, তাতে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে না। ভারতবর্ষেও অর্থনীতি গরীব জনতার জীবন যাত্রার মানকে উন্নত করার পরিবর্ত্তে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কোটীপতিদের পকেট ভর্ত্তির উদ্দেশ্যে চালিত হচ্ছে; তা ব্যবহারিক জীবনে প্রতিদিন টের পাওয়া যাচ্ছে। তবুও আলোচনা করা উচিত গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠ শিষ্য প্রশিষ্যদের হাতে দেশের অর্থনীতি কিরূপ নিয়েছে এবং নিচ্ছে; কারণ সেই হিসাব না নিলে গান্ধীয় সমাজবাদের খাঁটী রূপ বোঝা যাবে না। বর্ত্তমান কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর উপদেশ মেনে চলছেন না, একথা বলার কোন যুক্তিযুক্ততা নেই যেহেতু ক্ষমতা পাবার আগে মুখে অনেক বড় বড় কথা বললেও ক্ষমতা পাবার পর গান্ধীপন্থিদের

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

একমাত্র বিপ্লবী নেতৃত্বের অধীনে গণমোর্চ্চা নেপালকে বাঁচাতে পারে

নেপালের জনসাধারণ রাণাশাহীর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম আরম্ভ করেছে তাকে পেছন থেকে ছুরি মেরে বানচাল করার ষড়যন্ত্র চারিদিক থেকে চলেছে। এ চক্রান্তে যেমন ইঙ্গমার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর দল যোগ দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধাররা এবং ঐ আন্দোলনের আপোষকামী নেতৃত্ব। প্রতিক্রিয়ার এই মিলিত শক্তি জানে যে, যদি এ আন্দোলন চলতে থাকে তাহলে তার নেতৃত্ব সংগ্রামশীল জনতার হাতে চলে যাবে এবং তাতে শুধু বর্ত্তমান রাণাশাহীই খতম হবে তাই নয়, তাতে সমস্ত রকম শোষণ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে নেপাল সমাজতন্ত্রের পথে এগুবে। সুতরাং জনসাধারণের এই সংগ্রাম যাতে সেই রূপ নিতে না পারে তার চেষ্টাই চলেছে। নেপালী জনসাধারণ এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সজাগ না থাকলে তাদের অজ্ঞতার এবং স্বার্থত্যাগের সুযোগ নিয়ে বর্ত্তমান রাণাচক্রের সঙ্গে আপোষ আলোচনা মারফৎ এমন একদল লোক ক্ষমতা দখল করবে যারা রাণাশাহীর ধ্বংস না করে, তাকে একটু হের ফের করে শোষণ কাঠামো মূলতঃ ঠিক রেখে রাজত্ব চালাবে। তাতে জনসাধারণের দাবী কিছুই প্রতিষ্ঠিত হবে না, তাদের জীবনের কোন সমস্যারই সমাধান হবে না শুধু একদল শাসক শোষকের বদলে অন্য একদল শাসক শোষক গদীতে বসে আগের মতন শোষণ চালাবে। ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস এ বিষয়ে নেপালী জনসাধারণের স্মরণ রাখা উচিত। ভারতবর্ষে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে রফা করে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে আগের শাসনযন্ত্রটি মূলতঃ ঠিক রেখে ভারতীয় জনতাকে আগের মত শোষণ করে চলেছে। দিল্লীর মসনদে কংগ্রেসী নেতারা বসছেন কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সামন্ততান্ত্রীক এবং পুঁজিবাদী শোষণ আজও আগের মতন জনসাধারণের ঘাড়ের ওপর চেপে বসে আছে, কয়েক ক্ষেত্রে শোষণের মাত্রা বেড়েছে বই কমে নি। এই অবস্থা সম্ভব হয়েছে কারণ সংগ্রামী ভারতীয় জনতার নজর ছিল না নেতৃত্বের শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে। তাই নেপালী জনসাধারণ সচেতন না থাকলে, এই আন্দোলনে নিজেদের আপোষহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, আপোষকামী নেতৃত্বকে শক্তিহীন করে দিতে না পারলে, ভারতবর্ষের বিশ্বাসঘাতকতার পুনরাবৃত্তি হবে নেপালেও। জনতা লড়বে ও রক্ত ঢালবে; আর আপোষকামী প্রতিক্রিয়াশীলরা চুপিসাড়ে ক্ষমতার দিকে এগুবে। অবশেষে ক্ষমতা দখল করে এখনকার মত জনস্বার্থ বিরোধী শাসন চালাবে।

বিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্র গণআন্দোলন দেখলে ভয় পায়, কারণ সে জানে এ আন্দোলন ব্যাপ্ত হলে তার নেতৃত্ব চলে যাবে এবং শোষণের শেষ করবে। তাই সে আপোষের পথ ধরে। যে আপোষ সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ দুএর সঙ্গেই চলে। এখনকার চূড়ান্ত সামাজিক শ্রেণী সমাবেশের দিনে সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তি শ্রেণী হিসাবে প্রতিক্রিয়া শিবিরে, জনশক্তির শত্রু। তাই তো রাণাশাহীর বিরুদ্ধে নেপালী জনসাধারণ যে লড়ছে তাকে বানচাল করে রাণাশাহী টিকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে ওয়াল ষ্ট্রীট, ডাউনিং ষ্ট্রীট এবং দিল্লীর পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিরা। নেপাল হল এদের অবাধ শোষণের ক্ষেত্র। বৃটীশ বোর্ড অফ ট্রেড এর বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৯৪৮ সালে ৩০, ২৮৫ এবং ১৯৪৯ সালে ২৪,৪৬৩ পাউণ্ড দামের মাল নেপালে রপ্তানী করা হয়। এর বিনিময়ে সেখান হতে জলের দরে কাঁচামাল টেনে নিয়ে যায় বৃটীশ কোটীপতিরা। তার ওপর নেপাল হল এই সব সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের কামানের খোরাক জোগাবার জায়গা, সৈন্য সংগ্রহের ক্ষেত্র। সুতরাং যদি বর্ত্তমান রাণাশাহীকে টিকিয়ে রাখা এবং জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা আসাকে বন্ধ করা না যায় তাহলে তাদের এসব শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে—এ সত্য সাম্রাজ্যবাদীর দল ভালভাবেই বোঝে। তাই ভারতবর্ষাস্থিত বৃটীশ ডেপুটী হাই কমিশনার, মিঃ রবার্টস, নেপালে দৌড়াদৌড় করছেন, নিউইয়র্ক টাইমস সম্পাদকীয় লিখে উপদেশ দেন—"However, it seems clear that the feudal Rana regime will have to make some concessions to our more democratic era!" রাণাশাহীর খতম নয়, কিছুটা সুযোগ ছাড়তে হবে। বৃটেনের মন্ত্রীসভা তো বর্ত্তমান রাণাদের কার্য্যকলাপকে একরকম সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েছে। আমেরিকা তো নেপালে যুদ্ধঘাঁটী বসাবার চেষ্টা আরম্ভ করছে অনেকদিন থেকে। বর্ত্তমানে রাণাচক্র নেপালে সৈন্য পাঠাবার আবেদন করেছে মার্কিণের কাছে।

বৃটেনের পর নেপালে ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থ সব চেয়ে বেশী। সুতরাং তাদের প্রতিভূ নেহেরু সরকার তো চাইবেই নেপালে যেন প্রকৃত গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হয়। প্রথমতঃ গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতীয় ধনকুবেরদের শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় সীমান্তে প্রগতিবাদী গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার যে চক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্টরা করছে এবং ভারতবর্ষে তার এক বিরাট ঘাঁটী গাড়বার যে পরিকল্পনা রয়েছে তা অনেকাংশে ব্যর্থ হয়ে যাবে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাগ্রত জনশক্তি এবং তাদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি, মহাচীনের দুর্ব্বার অগ্রগতি, তার ওপর যদি নেপালে জনশক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে তাহলে পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রের শক্তি অনেক কমে যাবে। সুতরাং বর্ত্তমান আন্দোলন গণবিপ্লবের রূপ নেবার আগেই তাকে থামিয়ে আপোষপন্থী নেপালী-কংগ্রেসের হাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভার দেবার চেষ্টা চলেছে। শ্রেনী বিচারে নেপালী-কংগ্রেসের নেতৃত্ব ভারতীয় কংগ্রেসের সমগোত্রের। তাই তার হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকলে ভয়ের কিছু নেই ভারতীয় পুঁজিপতিদের। উপরন্তু হয়ত বেশী কিছু সুযোগ সুবিধা মিললেও মিলতে পারে।

এইসব বিষয় পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়বে ভারত সরকার ও নেপাল সরকারের মধ্যে যে আপোষ আলোচনা চলছে তা বিচার করলে। পণ্ডিত নেহেরু ভারতীয় পার্লামেন্টে গত ২১শে ডিসেম্বর

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

মধু ও হুল

Plain living and high thinking নাকি ভারতবর্ষের আদর্শ; এ সম্বন্ধে যে কত গল্প প্রচলিত আছে তার ইয়ত্তা নেই। পণ্ডিত বুনো রামনাথের তেঁতুল পাতার ঝোলের উদাহরণ সকলেরই কণ্ঠস্থ। ইংরেজ জাতটা আবার এই মতটা নিয়ে মাতামাতি করতে চায় না তাই বিদেশী শাসনের যুগে এর তত প্রচার হয় নি। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রী মণ্ডল গঠিত হবার পর মণ্ডলাকারে ঘুরছে এই নীতিটা প্রত্যেকের মুখে মুখে। রাজাজী থেকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ আর প্যাটেল থেকে পাটকল মালিক বিড়লা সকলেই অজ্ঞ দেশবাসীকে এই সনাতন নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করতে উপদেশ দিচ্ছেন। ধর্ম্মপ্রচারের গোড়ার কথা হ'ল—'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরেরে শেখাও'। তাই পণ্ডিতজীর মন্ত্রীর দল নিজেরাই Plain living আরম্ভ করে দিয়েছেন। কে বলে তাঁরা এক একজন শ্বেত হস্তী! মোটে তো এক একজন মন্ত্রীর জন্য বছরে দুলাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা করে খরচ হয়েছে; অবশ্য এ হিসাবটাও পুরো নয়, কারণ এর মধ্যে বহু 'incidental charge' ধরা হয়নি। এত যে কত কষ্ট করে মন্ত্রীদের থাকতে হচ্ছে তা ও বলে না তাই সাধারণের ভাব রোমাঞ্চ দেখা দেয়। আর high thinking যে তাঁরা করেছেন তাতে সন্দেহ কি? উঁচু চিন্তা না করলে কি মন্ত্রী হবার পর বাড়ী গাড়ী ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বেড়ে ওঠে? জয় গান্ধী মহারাজের জয়; যুগযুগান্তর ধরে বেঁচে থাকুন তাঁর চেলা চামুণ্ডার দল আর তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনার নীতি। মন্ত্রীদের সেই সাত্বিক জীবন দর্শন শ্রবন কীর্ত্তন করে আমরা ইহজ দেশবাসীর দল ভবসমুদ্রে [illegible] থেকে পাড়ি মারি।

রামরাজত্বে অবিচার হতেই পারে না। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনই হ'ল এর নীতি। দুষ্ট জনসাধারণ অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের দাবী করেছিল কংগ্রেসী রামানুচররা তাদের দমন করার জন্য নিরাপত্তা আইন চালু করলেন; কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষে এখন ধর্ম্মরাজ্য চলছে তাই এই দমন বিষয়েও প্রতিহিংসার চিহ্নমাত্র নেই। সাধুদের সুখসাচ্ছন্দ্যের জন্য এবং দুষ্কৃতিকে দমন করার জন্য এই সব মহামানব ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। দুষ্কৃতদের ওপর এঁদের কোন রাগ নেই; পাপকে এঁরা ঘৃণা করেন, পাপীকে নয়। তাই দুষ্ট জনতাকে দমন করলেও তারা যার জন্য লড়েছিল সেই অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের পাকা ব্যবস্থা এঁরা করে দিলেন খোঁয়াড়ের মধ্যে। আর যাঁরা শিষ্ট তাঁদের জন্য কি দরাজ হাতই না এ সব অবধূতদের। শ্রীগোপাল স্বামী আয়েঙ্গার পার্লামেন্টে জানিয়েছেন, যতদিন নিজাম বেঁচে থাকবেন ততদিন তাঁকে বাৎসরিক এক কোটি টাকা করে দেওয়া হবে, নিজাম বাহাদুরের পুত্র পৌত্রাদির জন্য ও এই রকম ব্যবস্থা হবে—তাতে ১৬কোটির মত লাগবে। পাছে লোকে বলে শুধু রাজাবাহাদুরদের বেলায় এক চোখোমি হচ্ছে তাই যাতে বেঙ্গল সাহেবদের কিছু হয় সেই উদ্দেশ্যে এক লাখ একর ধানের জমিতে পাট চাষ করার আদেশ জারী হয়েছে পশ্চিমবাংলায়। যে আটচোল্লিশ কোটি টাকা বাড়'ত মুনাফা বিড়লা বেঙ্গল সুরজমলরা পেয়েছেন সেটা যাতে আরও বাড়ে তার জন্যই এই ব্যবস্থা। বেঁচে থাকুক রামরাজত্ব। আর বাঁচতে হলে গলা ছেড়ে বলুন—জয় জয় রঘুপতি" ইত্যাদি।

★তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার পাকা পরিকল্পনা গৃহিত★

পশ্চিম ইউরোপে মার্কিণ নেতৃত্বে ৬০ ডিভিসন সৈন্য মোতায়েন-মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৫৫লাখসৈন্য পোষণ

●এই বছরেই সমরাস্ত্রের জন্য ১৮০০,০০,০০০০০ ডলার ব্যয় মঞ্জুর●

ট্রুম্যান সাহেব বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে খুব বড় বড় চটকদার কথা বলেন; জগতের দুর্গতির কথা বলে দু-চার ফোঁটা কুম্ভীরাশ্রুও ফেলে থাকেন —ভাবখানা এই রকম, গোটা দুনিয়ার শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার মহান দায়িত্ব তাঁর ওপর নির্ভর করছে। অথচ এ সব যে একেবারে ধাপ্পা সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। ওয়াল ষ্ট্রীটের কোটীপতিরা ও তাদের প্রতিনিধি ট্রুম্যান একিসন বিশ্বশান্তি চায় তাই তো আমেরিকা পাগলের মত সৈন্য সংখ্যা ও সমর সম্ভার দ্রুত গতিতে বাড়িয়ে চলেছে। জানুয়ারী মাসে সৈন্য রিক্রুটের কথা ছিল ৪০ হাজার, তাকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৮০ হাজার, ফ্রেব্রুয়ারীতে ছিল ৫০ হাজার তাকেও বাড়ান হয়েছে ৮০ হাজারে। কোরিয়া যুদ্ধের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত মোট নতুন সৈন্য ভর্ত্তি হয়েছে ৩ লাখ ৭০ হাজার। শীঘ্রই একে বাড়িয়ে ৩৫ লাখ করা হবে, এ কথা ট্রুম্যান সাহেব জানিয়েছেন। এর ওপর ন্যাশানাল গার্ড ও রিজার্ভে রাখা হয়েছে ২০ লাখ সৈন্য। এই ৫৫ লাখ মার্কিণ সৈন্য নিশ্চয় শান্তির জন্যে? সৈন্য দল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমর সম্ভারও বাড়ান হচ্ছে অপেক্ষিক ভাবে। এক বছরেই ১৮০০ কোটী ডলার খরচ মঞ্জুর করেছে মার্কিণ সেনেট অস্ত্রশস্ত্রের জন্যে। ৫০ কোটী ডলার খরচ করে নতুন কারখানা তৈরী হচ্ছে আণবিক বোমা প্রস্তুত করার জন্যে। রাজধানী হতে ২০ মাইল দূরে এক অজ্ঞাত স্থানে খাস অফিস গুলি সরাবার জন্যে ১৯ কোটী ডলার ব্যয়িত হচ্ছে। আমেরিকার ২১টি রাষ্ট্রের এক সভা ডাকা হয়েছে যুদ্ধের সমস্ত পাকা ব্যবস্থা করতে। তবুও স্বীকার করতে হবে মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের চালকরা শান্তি চায়! এত করেও সন্তুষ্ট নয় এই সব নরহন্তার দল, তাই হিটলার গোয়েরিং গোয়েবলস চক্র জার্ম্মাণ জাতিকে যুদ্ধোন্মাদ করে তুলবার উদ্দেশ্যে যেমন বছরের পর বছর অবিশ্রান্ত ভাবে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে বলেছিল—জার্ম্মান জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন, যুদ্ধ না করে তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার অন্য কোন উপায় নেই তেমনি ট্রুম্যানও মার্কিণে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে বলেছেন—"আমাদের গৃহে, আমাদের জাতি, আমরা যা বিশ্বাস করি সে আজ গভীরভাবে বিপদগ্রস্ত।" সরল সুকুমার শিশুরাও যাতে এই সর্বগ্রাসী অপপ্রচারের প্রভাব থেকে মুক্তি না পায় সেই উদ্দেশ্যে শিশু পাঠ্য বই গুলিতেও শেখান হচ্ছে—'A' তে এটম, 'B' বোমা, ইত্যাদি আর কেন যুদ্ধ বাধাতেই হবে। মার্কিণ প্রচার দপ্তরের হাতে পড়ে চাঁদ আর চাঁদ নেই—তা হয়ে উঠছে বিরুদ্ধ পক্ষের ওপর বোমা বর্ষণের উপযুক্ত ঘাঁটী। এ ঘাঁটী জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিই একমাত্র ব্যবহার করতে পাবে এবং সে হচ্ছে মার্কিণ। বর্ণ বিদ্বেষ এবং যুদ্ধ প্রচার মার্কিণের চলচ্চিত্রের উপজীব্য (Destination Moon) ছবিটি। এর পর আর কোন সন্দেহ থাকে না, ট্রুম্যান শান্তি চায়! ট্রুম্যান গোষ্ঠি শান্তি চায়, তাই তো জেনারেল আই সেন হাওয়ের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপে ৫০ থেকে ৬০ ডিভিসন সৈন্য মোতায়েন রাখার পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল। পট্সডাম চুক্তির মাথায় লাথি মেরে জার্ম্মানীকে অস্ত্রসজ্জিত করে তোলা হচ্ছে; নাৎসী সমর নায়কদের ওপর এই যুদ্ধ প্রস্তুতি গড়ার ভার দেওয়া হল। এই শান্তির আশায় সম্ভবতঃ ৮৫ হাজার জাপানী সৈন্যকে পাকাপোক্তভাবে তৈরী করে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং কে বলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবাদী?

কিন্তু শত্রু কোথায়, কে মার্কিণ জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করল? অবাক বিস্ময়ে সাধারণ মার্কিণ বাসী প্রশ্ন করে। ট্রুম্যান সাহেব জবাব দিলেন—"World conquest by communist imperialism is the goal of the forces of aggression that have been let loose upon the world।" কিন্তু কোথায় এই সোনার পাথর বাটি টি—"Communist imperialism," সাম্যবাদী সাম্রাজ্যবাদ? সাম্যবাদ কখন ও সাম্রাজ্যবাদ হতে পারে না, সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ হল পুঁজিবাদ। তাতে কি হল—ট্রুম্যানের মতে সাম্যবাদ সম্রাজ্যবাদ হতে পারে যখন, তখন তা হতেই হবে। কিন্তু তা কোথায়? কোরিয়ায়, ভিয়েৎনামে, মালয়ে, ফিলিপাইনে, ব্রহ্মদেশে। শোষিত মানুষের দল যেখানেই শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, স্বাধীনতাকামী মানুষ যেখানে বিদেশী শাসন উচ্ছেদের জন্যে লড়বে, ফ্যাসিবাদী জুলুমবাজীর অবসানের চেষ্টায় যেখানেই প্রগতিশীল মানুষ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করবে, সেখানেই সে সব ট্রুম্যানের মতে হল সাম্যবাদী সাম্রাজ্যবাদের কারসাজী। কোরীয়াবাসীরা নিজের দেশের সমস্যা নিজেরা মেটাতে চেয়েছে, ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক স্বাধীন কোরিয়া গোড়তে তারা চেয়েছে তাই তা হল সাম্যবাদী আক্রমণ, মার্কিণ সৈন্য সেখানে দেশের সম্পদ লুটতে চলে গেল। ভিয়েৎনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং শোষনের অবসান চায় দেশবাসী; সুতরাং ভিয়েৎমিনদের মুক্তি আন্দোলন হয়ে পড়ল আক্রমণ। মার্কিণ সমর সজ্জা ফরাসীর পেছনে এসে দাঁড়াল। মালয়ের দেশ প্রেমিকরা ইঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী শাসন উৎখাত করতে চায় ফলে তা সাম্যবাদী সাম্রাজ্যবাদ না হয়ে পারে না। ফিলিপিনোরা তাদের দেশের ওপর মার্কিণের কর্তৃত্ব ও শোষণ মানতে নারাজ; অতএব বোমারু বিমান পাঠিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করতে হল মর্কিণ সমর কর্ত্তাদের। মহাচীনের জনসাধারণ ইঙ্গমার্কিনের পদলেহী চিয়াংকাইশেককে চায় না। সুতরাং মাঞ্চুরিয়ার ওপর বোমাবর্ষণ কর এবং মহাচীনের রাজ্যস্থিত ফরমোজা দ্বীপ দখল করে নাও। সারা পৃথিবীতেই মার্কিণের এই রকম শত্রু; তাই তো ট্রুম্যানের মতে মার্কিণ জাতি বিপন্ন। যারা পৃথিবীর এই সব শোষিত মানুষ নিজের নিজের দেশের মুক্তিই চাছে, মার্কিণের ত্রিসীমায় ঘেঁসেনি তবুও মার্কিণ সৈনা, নৌ ও বিমান বাহিনী তাদের নিশ্চিহ্ন করার কাজে নেমেছে। তা হলেও মার্কিণ জাতি বিপন্ন ওয়ালষ্ট্রীটের মতে।

ট্রুম্যান সাহেব ঘোষণা করেছেন, "এই সমস্ত অস্ত্রসস্ত্র কেবলমাত্র আমাদের সৈন্য বাহিনীর অস্ত্রসস্ত্র জোগাবে না; তারা স্বাধীনতার রক্ষার কাজে সর্বত্র ব্যবহার করা হবে"। কে বলল, মার্কিণ কর্ত্তারা বিশ্ব বিজয়ের স্বপ্ন দেখে? একচেটে পুঁজিবাদের বিরাট পেট ভর্ত্তির জন্যে আজ তার বিশ্বের বাজার দরকার—একথা কে বলে? মার্কিণ সৈন্য পাঠিয়ে দেশকে কার্য্যতঃ জয় করে সেখানে একটি তাঁবেদার সরকার খাড়া করে নিরঙ্কুশ শোষণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিণ নীতি পরিচালিত হচ্ছে এ কথাও কে আবার বলে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা করছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর স্বাধীনতা রক্ষা করা। তাই তো কোরিয়ায় নির্বিচারে বোমা বর্ষণ হচ্ছে। আমেরিকার Life পত্রিকার সংবাদদাতা জন অসবোর্ণের রিপোর্ট সাক্ষ্য দেবে মার্কিন কেমন স্বাধীনতার লড়াই লড়ছে কোরিয়ায়। উক্ত কাগজটি ঘোর সাম্যবাদ বিরোধী; সুতরাং ট্রুম্যান সাহেবের সাম্যবাদী সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ওকালতি করার কোন কারণ তার নেই। রিপোর্টে মিঃ অসবোর্ণ লিখেছেন—"গ্রামকে গ্রাম মুছে ফেলা হচ্ছে, উদ্বাস্তুদের গুলি করা হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ান পুলিশ ও সৈন্যদের বেনামীতে হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতা চলছে। এরা একেবারে পশু। বন্দীদের সঙ্গে নিয়ে যাবার ঝামেলা এড়াবার জন্যে এরা তাদের গুলি করে মেরে ফেলে, রাস্তার লোক তাদের পথচলার অসুবিধার কারণ হলে তাদের গুলি করে মেরে ফেলে পথ করে নেয়। স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে যে নৃশংস অত্যাচার করা হয় তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ভদ্র আমেরিকানদের অন্তরাত্মা ভেদ করে একটি কথা বের হচ্ছে—ভগবান, আমরা অনেক নীচে নেমেছি, শিশুদের আমরা গুলি করে মারছি।" কোরিয়াবাসীদের কোন জাতের স্বাধীনতা দিচ্ছে মার্কিন কর্ত্তারা তার আর এক টুকরো দলিল হল—"আমেরিকান সেনাপতিদের আদেশে সুবোন কেন্দ্রি প্রদেশে ১১৪৬, উত্তর চুনচেন প্রদেশে ৭৩৯, ছোনজুতে ২০০০, চোনজুতে ৪০০০, তাইজেনে ৮৬৪৪, এবং পুজেতে ২০০০ অসামরিক লোককে হত্যা করা হয়েছে। শ'এর হিসাবে হত্যা আরও বহু গ্রামেই হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নারী ধর্ষণ ও লুণ্ঠন চলেছে। যে সমস্ত নারী বাধা দিয়েছে, তাদের সঙ্গীনের খোঁচায় চোখ উপড়ে নিয়ে, বন্দুকে কুদো দিয়ে হাত পা ভেঙ্গে দিয়ে তাদের ওপর বলাৎকার করা হয়। একদিন হেজু সহরে আমেরিকান সৈন্যরা বিদ্রোহী সন্দেহে ১১২১ জন কোরিয়ানকে গ্রেপ্তার করে। তাদের উলঙ্গ করে হাঁটিয়ে কবরখানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের দিয়েই নিজেদের কবর খোঁড়ান হয়। কেউ আপত্তি করলে সঙ্গীনের খোঁচা মারা হয়। কবর খোঁড়া শেষ হলে লোকগুলিকে তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে তাদের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুণ লাগিয়ে দেওয়া হয়, তার পর চলে গুলি।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ববাসীর স্বাধীনতা রক্ষার গুরু দায়িত্ব নিয়েছে—এরপর আর কোন সন্দেহই থাকে না।

তবে একথাও ঠিক বিশ্ববাসী শান্তি, স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্রের জন্যে লড়ছে। সে শক্তি আমেরিকার এই পৈশাচিক শক্তিকে ধ্বংস করে জগতে স্থায়ী শান্তি এবং প্রকৃত মুক্তি কায়েম করবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গণশত্রু যত বাড়ে ফ্যাসিবাদ তত মরিয়া হয়। ফ্যাসিবাদী যুদ্ধবাদীদের এই চরম পৈশাচিকতা তাদের নিকট ধ্বংসের নিশানা দিচ্ছে। সেই দিনকে ত্বরান্বিত করার কাজে আমাদের দেশেও শান্তিবাদী শক্তিগুলিকে একত্রিত করে জোরদার শান্তির লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। ভারতবর্ষ, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, মালয়, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের কমরেডদের প্রতি যে নিষ্পে সেই হবে তার যোগ্য প্রত্যোত্তর।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য নীতি

ভারীশিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি হ্রাস

বিলাতী মদের আমদানী চারগুণ বৃদ্ধি

দেশের শিল্পোন্নতির জন্য ভারতবর্ষকে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে নেতাদের বিশ্বাস-ঘাতকতার দরুণ। দেশকে শক্ত করে গড়ে তুলতে হলে, তাকে সমৃদ্ধ ও আত্ম-নির্ভরশীল করতে হলে মূল শিল্পগুলি দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। তার বদলে নেতারা এমন নীতি চালাচ্ছেন যে, ভারত-বর্ষ চিরকাল কৃষি ও কাঁচামালের দেশ থেকে যাবে এবং বিদেশী পুঁজিপতির দল ভারতের কাঁচা মাল লুঠে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাদের দেশের তৈরী উৎপাদিত মাল বিক্রী করবে। এ অবস্থা আমাদের দেশে চলতে থাকলে ইঙ্গ-মার্কিন তাঁবেদার হওয়া ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর থাকবে না।

যন্ত্রপাতি, মোটর, ইঞ্জিন প্রভৃতি মূল শিল্প গোড়ে তোলার বদলে এখানে শুধু জোড়া লাগানর কাজ করা হচ্ছে। ভারতবর্ষে মোটর শিল্প ভালভাবেই প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু তা না করে বিড়লা ন্যুফিল্ড কিংবা ঐ জাতীয় চুক্তি করে এখানে বিদেশ থেকে অংশ আমদানী করে তাদের জুড়ে গাড়ী বানান চলছে। অবশ্য গাড়ীর ওপর ভারতে প্রস্তুত ছাপ মারা থাকছে। যুদ্ধের আগে জাপান থেকে গুদাম বোঝাই কাপড় এনে যেমন বড় বাজারের আড়তে তার ওপর ভারতের 'নিজ কলের সুতায় প্রস্তুত' বলে ছাপ লাগিয়ে দেশী জিনিষ বলে বিক্রী করা হ'ত বেশী দামে, দেশের লোকের দেশীয় শিল্প প্রীতির সুযোগ গ্রহণ করে, এখনও তাই চলেছে।

এই ঔপনিবেশিক শোষনের জন্য গালভরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের বুলি কপচান হচ্ছে এবং প্রচার করা হচ্ছে যারা পৃথিবীর শ্রমশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করতে হলে যে দেশ যে জিনিষ কম খরচে তৈরী করতে পারে তাকে তা তৈরী করতে দেওয়া উচিত, অন্যদেশে তা উৎপাদন করতে যাওয়া ক্ষতিকর। অর্থাৎ ইঙ্গ মার্কিন যেহেতু নতুন শিল্প গোড়তে গেলে যা খরচ হবে তার চেয়ে অনেক কম খরচে ঐ জিনিষ উৎপাদন করতে পারবে সেই হেতু ইঙ্গ মার্কিনের কাছ থেকে ঐ জিনিষই আনা লাভের। ভারতের মত দেশের উচিত শিল্পের কাঁচামাল যোগান দেওয়া। সাম্রাজ্যবাদীদের এই শয়তানি কংগ্রেসী সরকার মেনে নিয়েছে আংশিকভাবে।

কলম্বো প্ল্যান অনুসারে ভারতবর্ষের ছয়সালা এক পরিকল্পনা ভারতীয় অর্থমন্ত্রী পার্লামেণ্টে উপস্থিত করেছেন। এতে কৃষি এবং কৃষিপণ্য চলাচল ব্যবস্থার জন্য মোট পরিমানের শতকরা ৭১ ভাগ ব্যয়িত হবে বলে স্থির করা হয়েছে। শিল্পে উন্নতির সুযোগ এইভাবে গোড়াতেই বেঁধে দেওয়া হল। তারপর আবার কৃষি ও যানবাহন ব্যাপারেও ভারতবর্ষ যাতে স্বাবলম্বী হতে না পারে তার পাকা ব্যবস্থাও আছে। যেমন, খাদ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যস্থল হল শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি। নয়াচীন এক দুসালা পরিকল্পনার মারফৎ খাদ্য শস্য উৎপাদন শতকরা ৪৪ ভাগ বৃদ্ধি করেছে; আজ মহাচীন হতে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়ে। যে জায়গায় ছ বছর বাদে ভারতবর্ষের খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা হল শতকরা ৭ ভাগ। এটাও বাস্তবে বাড়বে কিনা কে জানে? আর যদি ধরেও নেওয়া হয় বাড়বে, তাহলে তাতেও লাভ কিছু হবে না; কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত খাদ্যশস্যের চাহিদা এর চেয়ে অনেক বেশী হবে। ফলে কৃষির আপেক্ষিক উন্নতি কিছুই হবে না। যানবাহনের ব্যাপারেও তাই; আমরা বৃটিশ শিল্পপতিদের কাছ থেকে অংশ কিনে এনে শুধু জোড়া লাগাব।

এই যে দেশকে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে বাঁধার ষড়যন্ত্র তা আমদানী রপ্তানীর দিকে তাকালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি তৈরী করার মত কোন জিনিষ ভারতবর্ষকে দেওয়া হল না; কংগ্রেসী নেতারা তার বদলে বিদেশ থেকে বেশী করে মদ আনার ব্যবস্থা করলেন। ভারতের অর্থ সচিব জানিয়ে-ছেন যে, বর্তমান বছরে যেখানে ১৩ লাখ টাকার বিলাতী মদ (ব্রাণ্ডি) আমদানী করা হয়েছে সেখানে আগামী বছরে করা হবে ৫০লাখ টাকার। বর্তমান বছরে উপরোক্ত ১৩লাখ টাকা ছাড়া অন্যান্য জাতীয় মাদক দ্রব্য আমদানী করা হয়েছিল ১কোটি ৮০লাখ টাকার। সেটাও বাড়বে কিনা তা বলা হয়নি। বড় কর্তাদের মেজাজ রাখার জন্য আড়াই কোটি টাকার মত বিলাতী মদ ভারতবর্ষে আমদানী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গান্ধীয় প্রথায়মাদক দ্রব্য বর্জন বোধ হয় এর নাম! দেশে শিল্প না গোড়ে মদেই টাকা ওড়ান হচ্ছে—চমৎকার নীতি বলতে হবে।

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ভারত সরকারের নেপালনীতি সম্বন্ধে বলেছেন— ভারত সরকার নেপালের বর্তমান সরকারকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, রাজা ত্রিভুবন ছাড়া ভারত সরকার অন্য কাউকে নেপালের রাজা বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। তাঁকেই নেপালের রাজা বলে মানতে হবে। রাণা পরিবার এবং জনসাধারণের প্রতি-নিধিত্ব করেন এমন কয়েকজন লোক নিয়ে অন্তবর্তী সময়ের জন্য অবিলম্বে মন্ত্রীসভা গঠন করতে হবে। এ ছাড়াও এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দেশটির ভবিষৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়-নের উদ্দেশ্যে কিছুমাত্র বিলম্ব না করে গণ পরিষদ আহ্বান করতে হবে।" এর প্রথম সর্ত হল রাজা ত্রিভুবনকে রাজা করতে হবে; দ্বিতীয় কথা রাণা পরিবার ও জনসাধারণের প্রতিনিধি (নেপাল কংগ্রেস—জওহরলালের মতে) নিয়ে অন্তবর্তী সরকার গঠণ করতে হবে এবং তৃতীয় বক্তব্য গণপরিষদ ডাকতে হবে। জনসাধারণ যে জন্য লড়ছে তার কোন কথাই এতে নেই বরং তার বিরুদ্ধে সব কথাই আছে।

কে রাজা হবে না হবে সে প্রশ্ন ওঠেই না। কারণ জনসাধারণ রাজতন্ত্র চায় না, তারা চায় জনরাষ্ট্র। রাজতন্ত্র ও রাণাশাহীর বিরুদ্ধেই জনতার সংগ্রাম। দ্বিতীয়ত: যে রাণাশাহীর বিরুদ্ধে এই আন্দোলন তাদের প্রতিনিধি এবং যে আপোষকামী নেতৃত্বে আন্দোলনের পায়ে বেড়ী দেবার চেষ্টা তাদের নিয়েই হবে অন্তর্বর্তী সরকার গঠণ। এ সরকার আমাদের দেশের কংগ্রেসী সরকারের মতই হবে। সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস, চাষীর হাতে জমি রাণাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি যে সমস্ত দাবীর পেছনে সমবেত হয়েছে জনতা তাকে রূপ দিতে পারে না এই সর-কার। অর্থাৎ যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব নেপালী জনসাধারণ সফল করতে চাইছে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে সামন্ত প্রভু-দের পায়ে জনস্বার্থ বিলিয়ে দেবার পাকা বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

এ আন্দোলনে সফলতা নির্ভর করছে প্রকৃত গণযোচা গঠনের ওপর। সমস্ত রাণা শাহী বিরোধী শক্তিকেই টেনে আনতে হবে এই মোর্চায়, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমাহীনভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে আপোষকামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। কারণ সংগ্রামের মধ্যে আপোষপন্থী কংগ্রেসী নেতৃত্বকে জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভারতবর্ষের মতই নেপালে সামন্ত-তন্ত্র ঘেঁষা পুঁজিবাদী শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করবে। রাজা ত্রিভুবনের সঙ্গে দহরম মহরম করছে বলেই যে নেপাল-কংগ্রেস নেতৃত্ব সামন্ততন্ত্র ঘেঁষা আর তা না করলেই তারা তা নয়—এ যে চিন্তা কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রকাশ করেছে তা ভুল। নেপাল কংগ্রেসের শ্রেণী চরিত্রই হল বর্তমান অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোষকামী, গণ আন্দোলন চালাতে তারা অনিচ্ছুক। রাজামহারাজার সাথে দহরম মহরম না করলেও তাদের নেতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং জঙ্গী গণনেতৃত্ব কায়েম করতে হবে। তা করতে পারলে তবেই আন্দোলন সফল হবে, নচেৎ তা মধ্য পথে থেমে যাবে, জনতার রক্ত ক্ষয় ব্যর্থ হবে।

যাদবগড় বাস্তহার
পুলিশের
পুলিশের বেপরোয়া গুলিচালনার ফ
দক্ষিণ কলিকাতা সংযুক্ত বাস্তহারা
শ্রীফটিক ঘোষে

"কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তে ঢাকুরিয়ায় যাদবগড় বাস্তহারা উপনিবেশে ১৬ কাটা জমি হইতে চারঘর বাস্তহারাকে উচ্ছেদ করার জন্য বুধবার ২৭শে ডিসেম্বর সকাল ১০-৩০ টার সময় পুলিশ কয়েকশত আশ্রয়-প্রার্থী নারী-পুরুষের উপর নির্লজ্জভাবে লাঠি, কাঁদুমে গ্যাস ও তিন রাউণ্ড গুলি চালায়। গুলি চালানর ফলে ২৪ বৎসর বয়স্কা গর্ভবতী নারী শ্রীমতী বীনাপানি মিত্র সহ প্রায় ৭০ জন নারী ও পুরুষ আহত হন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শ্রীযুক্তা মিত্র সহ ৭ জনকে লেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তিকরা হইয়াছে। গত কয়েকদিন যাবৎ উক্ত কলোনিতে পুলিশের হামলা আরম্ভ হয়।

উক্ত জমির মালিক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্ত্তমাণ রিলিফ কমিশনার শ্রীহিরন্ময় ব্যানার্জি আই, সি, এস এর ভ্রাতা শ্রীসুধাময় ব্যানার্জী। ৪/৫ মাস পূর্ব্বে চারঘর নিরাশ্রয় বাস্তহারা পরিবার জমির মালিক শ্রীসুধাময় ব্যানার্জীর জমিতে নিজেদের চেষ্টায় চারখানি ঘর তৈয়ারী করিয়া বসবাস আরম্ভ করে। গত ২৩ শে ডিসেম্বর এই জমি হইতে ১৪৪ ধারার অজুহাতে আশ্রয় প্রার্থীদের উচ্ছেদের ভার টালিগঞ্জ থানার পুলিশের উপর দেওয়া হয়। পুলিশ ২৪ শে ডিসেম্বর উক্ত জমিতে বাস্তহারাদের তৈয়ারী ঘর ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিলে, বাস্তহারাদের পক্ষ হইতে বলা হয় যে অন্যত্র বাসস্থান জোগাড় না করা পর্য্যন্ত অন্য কোথাও যাইতে তাহারা অক্ষম। ইহার পর ২৬ শে ডিসেম্বর একদল সশস্ত্র পুলিশ ঘরগুলির চারিপাশে সকাল হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ঘিরিয়া থাকে। কিন্তু স্থানীয় বাস্তহারারা ঐক্যবদ্ধভাবে ঘরের চারি ধারে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিলেপু, লিশ চলিয়া যায়।

বুধবার ভোরে পুনরায় একদল সশস্ত্র পুলিশ সহ আলিপুরের এস, ডি, ও উক্ত উপনিবেশে উপস্থিত হইয়া নিরাশ্রয় বাস্তহারাদের স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ দেন। কিন্তু বাস্তহারারা স্থান ত্যাগ

আলিপুরে বিরাট
সরকারী খাদ্য নীতির
ক্ষেতমজুর, চাষী ও মধ্যবিত্তের
সরকারী জুলুম

গত ২৪শে ডিসেম্বর ২৪পরগণা জেলা ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের উদ্যোগে আলি-পুরে এক বিরাট কৃষক জমায়েত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী।

প্রগ্রেসিভ কালচারাল এসোসিয়েসনের স্থানীয় শাখা কর্তৃক গণসঙ্গীত পর কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী সভায়

া উপনিবেশে হামলা

,ল গর্ভবতী নারীর মৃত্যু বরণ

়তি কমিটির প্রচার সম্পাদক ব বিবৃতি

'তে অস্বীকার করিলে প্রথমে পুলিশ ন্ত্র মহিলাদের উপর লাঠি ও গ্যাস ায়। ইহাতেও পুলিশ সন্তুষ্ট না ২য়া এস, ডি, ও র আদেশে প্রায় ৩/৪ াউণ্ড গুলি আশ্রয়প্রার্থীদের লক্ষ্য করিয়া হাড়ে। গুলি চালনার ফলে অতি নিকটে বস্থিত একটি পাকা বাড়ীর ভিতর গৃহ-র্ম্মে নিরত শ্রীবীনাপানি মিত্রের তলপেটে ইটি গুলি লাগে। তাঁহাকে গুরুতর স্থায় হাসপাতালে পাঠান হয়।

্ক্তো মিত্র আসন্ন প্রসবা গর্ভবতী এবং ন উক্ত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। শুক্রবারদিন হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু ইহাছাড়া গুলিতে শ্রীকেশব পাল নামক জন ২০ বৎসর বয়স্ক যুবক ও আহত ়াছেন। শ্রীগোকা রায় সহ ৩১ জন ক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।', তাই স্ত বাস্তহারা ভাইবোনের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি।

যে সরকার বাস্তহারাদের পুনবসতি ত্তে পারে না অথচ বাস্তহারারা যদি স্বদের চেষ্টায় কোথাও মাথা গোঁজবার গা করে নেয়, তখন জনপ্রিয় (?) এই ৎস কংগ্রেসী সরকার তাদের উপর মভাবে গুলি ও লাঠি চালায়। সুতরাং অত্যাচারী সরকারকে খতম করবার বাস্তহারাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। । এই পুজিপতি অত্যাচারী সরকার ান থাকবে ততদিন এরূপ অত্যাচার ়। বাস্তহারা আন্দোলন আজ আর শুধু বাস্তহারাদের জন্যই নয়, দেশের সমস্ত ্বত শ্রেণীর আন্দোলনের সহিত র। তাই এই কংগ্রেসী সরকারকে াত করার জন্য সমস্ত বাস্তহারাদের র কোটী কোটী শোষিত মানুষের মুক্তি দালনের সাথে যোগদিয়ে বিপ্লব ৎ রাষ্ট্র যন্ত্রকে দখল করে সেখানে ষিত শ্রেণীর রাষ্ট্র কায়েম করিতে ব। নতুবা কোনদিনই বাস্তহারার সন এবং শোষিত শ্রেণীর সুখে ়তে বসবাস সম্ভবপর নয়।

ৃষক জমায়েত

্দ্ধে তীব্র বিক্ষোভ

বদ্ধ আন্দোলন গোড়ে তুলে ়ার সংকল্প গ্রহণ

ধন করেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, টী দেশে শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন মধ্য-়র দুর্ব্বার অগ্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসী ারের জনস্বার্থবিরোধী নীতির লোচনা করে তিনি বলেন—"যতদিন ্রগী সরকার কায়েম থাকবে, ততদিন বিষয়েই জনসাধারণের সমস্যার

সত্যিকারের সমাধান হবে না। কারণ কংগ্রেস হ'লো ধনিক শ্রেনীর দল, সেই দল ধনিক শ্রেনীর স্বার্থ রক্ষা করবে, এটাই হ'ল অত্যান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। গরীব খেটে খাওয়া মানুষের দল রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে পারলে তবেই জনতার দাবী প্রতিষ্ঠিত হবে। অথচ রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ত করতে যে অস্ত্রের সবচেয়ে আগে দরকার তা হল গরীব জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। লাখে লাখে যোগ দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানকে গোড়ে তুলুন। প্রতিজ্ঞা নিন ভাইসব, এই সভা থেকে ফিরে গিয়ে প্রত্যেক অন্ততঃ দশজন করে ক্ষেত মজুর ফেডারেশন কিংবা যুক্ত কিষাণ সভার সভ্য করবইই। এ প্রতিষ্ঠানের জঙ্গী শক্তিই সরকারের অত্যাচার বন্ধ করবে।"

এর পর পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসী সরকারের খাদ্য নীতির সমালোচনা করে এবং জনস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে চালিত খাদ্যনীতিতে কি কি থাকা চাই তা দাবী করে পশ্চিম বাংলা যুক্ত কিষাণ সভার সহ সম্পাদক কমরেড সুধীর ব্যানার্জী এক প্রস্তাব আনেন। সম্প্রতি মূলারহাটে চাল ধান লুঠ করে চাষীদের ওপর যে জুলুমবাজী সরকার করেছে তার প্রতিবাদ করে এবং নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীর শাস্তি দাবী করে দ্বিতীয় প্রস্তাব আনেন বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেড কৃষ্ণলাল ব্যানার্জী। তৃতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন কমরেড অপরেশ চ্যাটার্জী, তাতে শান্তি আন্দোলনের রূপ আবশ্যকতা এবং ভারতবর্ষে সংহত শান্তি আন্দোলন কমিনফর্মের নির্দ্দেশ অনুযায়ী গোড়ে তোলবার জন্য দলীয় সঙ্কীর্ণতাদোষে দুষ্ট বর্ত্তমান শান্তি কংগ্রেসের পরিবর্ত্তে সর্বদল ও মত নির্বিশেষে শান্তিকামী জনতার প্রতিনিধি নিয়ে একটি সংযুক্ত শান্তি কংগ্রেস গড়ার দাবী জানান হয়।

সর্বশেষে সভাপতি সরকারী চাল ধান লুঠ করার নীতিকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে ক্ষেত মজুর, চাষী, এবং মধ্যবিত্তের মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান দেন।

মার্কিন ধনকুবেরদের মোটা লাভ

●কোরিয়ার লড়াইয়ে কোটী কোটী ডলার আয়●

★যুদ্ধের অর্থ জনতার প্রাণনাশ, ধনিক শ্রেণীর পাহাড়প্রমাণ মুনাফা★

ট্রুম্যান গোষ্ঠি শান্তির কথা বলে, এ কথা যে কত ফাঁকা তা একটু দেখলেই বোঝা যায়। মার্কিনের এক ডজন পরিবার ঐ দেশের গোটা অর্থনীতিটা চালাচ্ছে। ওয়ালষ্ট্রীটের এই সব কর্ত্তাদের প্রতিভূ হলেন ট্রুম্যান ও তাঁর দলবল। আর ওয়ালষ্ট্রীটের কোটিপতিদের একমাত্র লক্ষ্য হ'ল কেমন করে মুনাফা লোটা যায়। মুনাফার জন্য দেশবাসীকে না খাইয়ে রাখতে, তাদের নির্মূল করতেও পশ্চাদপদ নয় এই সব মুনাফা খোরের দল। পাছে ফসল বেশী হলে, খাদ্যদ্রব্যের দাম কমে যায় এবং ধনিক শ্রেনীর লাভ কমে যায় এই ভয়ে এই বছরও আলুর চাষ আমেরিকায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং উৎপাদিত বহু শস্য ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। যে দেশ এ কাজ করতে পারে সে দেশ যে লাভের জন্য যুদ্ধ বাধিয়ে আর একটা মারনযজ্ঞে মেতে উঠবে তাতে আর অবাক হবার কি আছে!

বিশেষ করে আমেরিকার যে সমস্ত রাষ্ট্রনীতিবিদরা দেশ শাসন করছেন তাঁরা বড় বড় ধনিক ট্রাষ্টের পরিচালক। ডুলেস, জেনারেল ব্রাডলে প্রভৃতি সামরিক কর্ত্তারা বড় বড় অস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডা। সুতরাং কোটি কোটী টাকা লুঠবার জন্য তারা যে জগতজুড়ে যুদ্ধের আগুণ জালিয়ে তুলতে ষড়যন্ত্র করবে—এটাই হল স্বাভাবিক। কোরিয়ার মত সামান্য একটা ছোট দেশের বিরুদ্ধে নেমে মার্কিন বিমান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কি প্রচণ্ড লাভ করেছে তার প্রমাণ হল নীচের তালিকা। গোটা ১৯৪৯ সালে এইসব কোম্পানিগুলির যে লাভ হয়েছিল ১৯৫০ সালের ক' মাসেই তার বহুগুণ বেশী মুনাফা এরা লুঠেছে।

একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে পারলে আমেরিকার ক্রোরপতিদের কি প্রচণ্ড লাভহয় তা বুঝতে অসুবিধা হয়না। সুতরাং যুদ্ধ তারা চাইবেই কিন্তু যুদ্ধের অর্থ সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি, অনাহার, দুভিক্ষ, মহামারি, অপমৃত্যু। জনতাকে নিজের প্রাণ দিয়ে কামানের খোরাক হতে হয় আর লাখ লাখ শ্রমজীবি মানুষের জীবন ধ্বংস করে বড় লোকের দশ্ব টাকার পাহাড় গড়ে।

এই কারনেই প্রত্যেকটি ধনবাদী দেশে জনসাধারণের শান্তি আন্দোলনকে ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্র করে চলেছে ধনিক শ্রেনী আর তার তাঁবেদারের দল। জনতা সংঘবদ্ধ হচ্ছে নিজের প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে আর ধনিকের দল শান্তি সংগ্রামকে বানচাল করতে চাইছে নিজেদের লাভ বাড়াবার উদ্দেশ্যে। প্রত্যেকটি শান্তিকামী মানুষকে তাই আজ সাম্রাজ্যবাদ-যুদ্ধবাদ বিরোধী শান্তির শিবিরকে সবল করে তুলতে হবে নিজেরই স্বার্থ রক্ষার্থে। শান্তির লড়াই আজ বাঁচার লড়াই।

নাম	১৯৪৯ সাল লাভ		১৯৫০ সাল লাভ		
বেনডিক্স এভিয়েশন	৪৯,৬৭,১২৯ ডলার		১২০,৯৮,১৭৯ ডলার		(৯ মাসে)
কনটিনেনট্যাল মোটরস	১৭,০১,০০৫	„	২৫,১৩,৬৬৭	„	„
বেল এয়ার ক্রাফট	১,৩৩.৩৩২	„	৪,৫৬,৪৭৬	„	(প্রথম ৬ মাসে)
বোইং এয়ার প্লেন	৬,২২,৩৪৯		৫৯,৬৪,১৫২	„	„
কার্টিস রাইট	১৯,০৯,৩০৯	„	(ক্ষতি) ৩৩,৮৫,২৬৭	„	„
গ্রুম্যান এয়ারক্রাফট	১৪,৫৭,১৩৪	„	৩৯,২১,৯১৪	„	„
রিপাবলিক এভিয়েশন	৩,১৭,৮৮৩	„	৬,৯৮,৮০৩	„	„
ইউনাইটেড এয়ারক্রাফট	৩৫,৯৫,৪২১	„	৬৪,৩২,১৩৬	„	„
রাইট এরোনটিকাল	২৩,৩৬,৬৭২		(ক্ষতি) ২০ ৩৭ ০৬০	„	

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

চলছে। গত তিন বছরের মধ্যে যে "ইণ্ডিয়া লিমিটেড" মার্কা বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতবাসীর রক্ত শোষণ করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাদের নাম ও মূলধনের পরিমান দেওয়া গেল। এ থেকে বোঝা যাবে তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ শুধু অক্ষুন্ন নেই তাই নয়, বেড়ে ও চলেছে দেশী পুজিপতিদের সহযোগিতায় ও দেশী আবরণের আড়ালে। ●●

সাম্রাজ্যবাদী দেশীয় পুঁজিবাদী জোট—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম—পুজিবাদী রাষ্ট্রউচ্ছেদের সংগ্রাম

তাহলে দেখা গেল তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পরও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের উৎখাত হয় নি। কিন্তু আজ আর সাম্রাজ্যবাদকে সামনা সামনি আক্রমণ করার কোন উপায় নেই ভারতীয় রাষ্ট্রকে আঘাত না করে। ভারতীয় শাসক পুজিপতি শ্রেণী, সাম্রাজ্যবাদের মিত্র, তার সহযোগী. উভয়ে বর্ত্তমান চূড়ান্ত সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের দিনে একতাবদ্ধ গণশক্তির অভ্যুত্থানকে ধ্বংস করার চেষ্টায়—সেই পুজিপতিশ্রেণীই তার ক্ষমতা সংগঠিত করেছে বর্ত্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ধ্বংস করতে হলে সাম্রাজ্যবাদের রক্ষক ভারতীয় ধনিক রাষ্ট্রকে, উৎখাত করতেই হবে। শ্রমজীবি মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে হলে পুজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী সামান্ততান্ত্রিক শোষণ টিকেয়ে রাখলে চলবে না; সমাজতন্ত্রের জয়েই মানুষের প্রকৃত মুক্তি আসা একমাত্র সম্ভব হবে। তাই কি মজুর. কি চাষী, কি মধ্যবিত্ত প্রত্যেককেই মিলিত হয়ে লড়তে হবে এই শোষণের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়ার ঐক্যবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে, জঙ্গী জনতার গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা গঠন করে। প্রতি স্তরের প্রগতিশীল মানুষের তাই হল এখনকার একমাত্র বিপ্লবী প্রচেষ্টা।

*বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী এসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর অভিভাষণের সারমর্ম

"আইসেন হাওয়ার ফিরে যাও"

এস, ইউ, সি, এস, বি এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তের ঘোষণা—

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের অন্যতম অধিনেতা জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। এই সংবাদে সমস্ত ছাত্র সমাজ এবং চিন্তাবিদ মাত্রেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত। যে এ্যাটলী ট্রুম্যান জোট আর একটি বিশ্বযুদ্ধ লাগাবার প্রচেষ্টায় উন্মত্ত জেনারেল আইসেনহাওয়ারও সেই একই দলভুক্ত। তিনি ইউরোপের পশ্চিম অঞ্চলের সুপ্রীম কমাণ্ডার নিযুক্ত হয়েছেন। এ হেনলোককে শিক্ষার ন্যায় পবিত্র স্থানে আসতে দিয়ে ছাত্ররা শিক্ষাকে অপবিত্র করতে দেবেনা। ছাত্ররা আজ এই বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এটা সমস্ত যুবসম্প্রদায়ের নিকট অপমান জনক ঘটনা। বাংলা দেশের ছাত্র সমাজ কখনই মেনে নিতে পারেনা—শিক্ষা ক্ষেত্রকে কলুষিত করতে তা নারাজ। তাই আমার আবেদন দেশের ছাত্র, যুবক চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজিবি সকলেই দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষনা করুণ—"আইসেনহাওয়ার ফিরে যাও"।

স্তালিন শাসনতন্ত্রে আজীবন কাজ পাবার অধিকার

লেখক :—এম্, রাগিনাস্কি ও এস্ রোসে নব্লিৎ

সোবিয়েৎ জনগণের অমূল্য পাওনা-গুলির একটি হচ্ছে কাজ পাবার অধিকার। অর্থাৎ নর ও নারী, জাতি বা সম্প্রদায়, সামাজিক মর্যাদা বা ধর্ম্মমত নির্বিশেষে প্রত্যেক সোবিয়েৎ নাগরিকের চাকরি পাবার এবং তার কাজের গুণাগুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী বেতন পাবার অধিকার আছে।

জে, ভি, স্তালিন বলেছেন, "সোবিয়েৎ দেশে প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক মর্যাদা নির্ণীত হয় ব্যক্তিগত গুণ ও ব্যক্তিগত শ্রমের দ্বারা—জাতিগত মর্যাদা দিয়েও নয়, ধনসম্পদগত মর্যাদা দিয়েও নয়, পুরুষ বা নারী এই পার্থক্য দিয়েও নয়।"

বুর্জ্জোয়া সমাজ সকল লোককে কাজ দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে সম্পূর্ণ অপরাগ। কেননা পুঁজিপতিরা বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাননা। বরং স্থায়ী বেকার বাহিনী থাকলেই তাঁদের ভালো হয়। অসংখ্য বেকারের অস্তিত্ব থাকলেই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় যে সব মজুরকে তাঁরা ভালো চোখে দেখেন না সুযোগ মতো তাঁদের বিতাড়িত করা ও তাঁদের জায়গায় অন্য লোক এনে ঢোকানো।

ধনতন্ত্রবাদের একান্ত বশংবদ অনুচর দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক দল শ্রমিক শ্রেণীকে এই কথা বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করছেন যে, বুর্জ্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এবং সকল লোকের কর্ম্মসংস্থান সম্ভবপর। এই অপপ্রচারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীর মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ক্ষতিসাধন করা। দক্ষিণ-পন্থীদের ঐসব প্রচারের কপটতা ও অসারতা একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ধরা পড়বে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়ঝাপটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গায়ে লাগেনি বললেই হয়। অধিকন্তু যুদ্ধের দৌলতে সে দেশ আরো বেশি টাকা করেছে। অথচ সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বছরের পর বছর বেকার লোকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সরকারী সংখ্যাতথ্য অনুসারে ১৯৪৪ সালে পুরোপুরি বেকারের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৭০ হাজার; ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সেই সংখ্যা সাতগুণ বেড়ে ৪৬ লক্ষ ৮৪ হাজারে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেকার সমস্যার একটা পরিষ্কার সামগ্রিক চিত্র পেতে হলে এই কথা মনে রাখতে হবে যে, পুরোপুরি বেকার ছাড়াও এমন লক্ষ লক্ষ আমেরিকান আছেন যাঁরা আংশিকভাবে কাজ করেন এবং তার ফলে দুঃখ দারিদ্র্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছেন না।

১৯৪৯ সালে পৃথিবীর সমস্ত পুঁজি-বাদী দেশের বেকার ও অর্দ্ধ বেকারের সংখ্যা ছিল ৪ কোটী; গত মার্চ্চ মাসের মধ্যেই সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ জন। বস্তুতঃ যতকাল পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় থাকবে ততকাল বেকারিরও অস্তিত্ব থাকবে।

স্তালিন বলেছেন, "সঙ্কট, বেকারি অপচয়, অভাব, দারিদ্র্য—এই সব হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের দুরারোগ্য ব্যাধি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এসব ব্যাধি না থাকার কারণ, আমাদের হাতে, আমাদের শ্রম-জীবী জনগণের হাতে এসেছে শাসন-ক্ষমতা। আমরা পরিকল্পিত অর্থনীতি অনুসরণ করছি, ঠিক মতো জাতীয় সম্পদ সঞ্চিত করছি এবং তা ঠিকমতো বন্টন করে দিচ্ছি জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে……এইখানেই পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের তফাৎ, এইখানেই পুঁজি-তন্ত্রের তুলনায় আমাদের নিঃসংশয়িত শ্রেষ্ঠত্ব।"

একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই কাজ পাবার অধিকার সত্যিকার ও সুনিশ্চিত—থাকতে পারে। স্তালিন শাসনতন্ত্র কেবল কাজ পাবার অধিকারের কথাটাই ঘোষিত হয়নি, সেই সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে যে (সোবিয়েৎ শাসনতন্ত্রের ১১৮ ধারা): "সকলের কাজ পাবার প্রতিশ্রুতি বাস্তবে পাকাপোক্ত করা হয়েছে জাতীয় অর্থনীতির সমাজ-তান্ত্রিক সংগঠন গড়ে তুলে, সোবিয়েৎ সমাজের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে, অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্ভাবনা দূরীভূত করে এবং বেকার সমস্যা ও বেকারির অবসান ঘটিয়ে।"

সোবিয়েৎ ভূমিতে এক মানুষ কর্ত্তৃক অপর মানুষের শোষণ চিরতরে লুপ্ত হয়েছে। কলকারখানাগুলি হয়েছে রাষ্ট্রের সম্পত্তি। অর্থনৈতিক সঙ্কটের কোনো সম্ভাবনাই নেই, কেন না সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে জাতীয় অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা। এই সব কারণে কোটি কোটি লোকের কাজ পাবার ও কাজ করার অপরিসীম সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৪৬ সালে মজুরি ও বেতনভুক শ্রমিকের সংখ্যা ৩০ লক্ষ জন বেড়ে গিয়েছিল; ১৯৫০ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে তার আগের ১৯৪৯ সালের উক্ত তিন মাসের তুলনায় সংখ্যা বেড়েছে ২৪ লক্ষ জন পর্যন্ত।

সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকেরই তাঁর দক্ষতা ও সৃজনী শক্তি প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি যখন ক্রমেই অর্থনৈতিক অবনতির ও বন্ধ্যা দশার মধ্যে আটক পড়ছে, অপরপক্ষে সোবিয়েৎ ভূমি ততই সগর্ব্বে এগিয়ে চলেছে নতুনতর ও উচ্চতর স্তরের অগ্রগতির পথে। ১৯৪৯ সালের মধ্যেই যুদ্ধ-পূর্ব্ব উৎপাদনের স্তরকে পেছনে ফেলে দেওয়া হয়েছে—কৃষি ও শ্রমশিল্প এই উভয় ক্ষেত্রেই। ১৯৫০ সালে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরও উন্নতি ও উর্দ্ধগতি লক্ষিত হচ্ছে। এ বছরেই ভলগা ও নীপার নদীর উপরে বিরাট জলবিদ্যুৎ ষ্টেশন এবং মেন তুর্ক-মোনিয়ান, দক্ষিণ-ইউক্রেনিয়ান ও উত্তর ক্রিমিয়ান খাল তৈরির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। এই বিশাল পরিকল্পনাগুলির কাজ শেষ হলে সোবিয়েৎ দেশের জাতীয় অর্থনীতি পেয়ে যাবে ২ হাজার কোটি কিলওয়াট-ঘণ্টা তড়িৎশক্তি এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ হেক্টার জমি পাবে জলসেচের সুব্যবস্থা। এর ফলে নতুন নতুন কর্ম্মচঞ্চল জনপদ গড়ে উঠবে, তৈরি হবে কত নতুন নতুন কারখানা। যার ফলে লক্ষ লক্ষ সোবিয়েৎ নাগরিক তাদের সৃজনী ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রয়োগের অনুকূলে ক্ষেত্র পেয়ে যাবেন।

কলকারখানার শ্রমিকরা যাতে তাঁদের চাকুরির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পান তার জন্যে বহু স্কুল ও কোর্স রয়েছে। শ্রমশিল্পের উপযোগী শিক্ষা দানের জন্যে সোবিয়েৎরাষ্ট্র প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থী যুবকদের জন্যে অসংখ্য ফ্যাক্টরী স্কুল খোলা হয়েছে। এই সব বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটেরা স্বাধীন-ভাবে তাদের শ্রমজীবী জীবন আরম্ভ ক'রে যথেষ্ট দক্ষতা ও কৃতিত্ব দেখাতে পারেন।

সোবিয়েৎ দেশে সমান কাজের জন্যে সকলেরই সমান বেতন। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। যে দেশে জাতি বৈষম্য ও অনৈক্য চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে, সেখানে এক জাতির শ্রমিক একই কাজের জন্যে অপর কোনো জাতির শ্রমিকের চেয়ে বেশি বা কম বেতন পাবেন এ হতে পারে না, কখনো হবেও না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকল সোবিয়েৎ নাগরিকের যে সমানাধিকার আছে তা কাজ পাওয়ার অধিকারের প্রশ্নেও সমভাবে প্রযোজ্য। এ বিষয়ে কোনরূপ বৈষম্য সোবিয়েৎ আইনে ঘোর অপরাধের কাজ।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে উল্টো ব্যাপার। সেখানে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাবার অধিকার কাজ পাবার অধিকারের মতোই একটা কথার কথা মাত্র। বুর্জ্জোয়া সমাজে মেয়েদের বেতন দেওয়া হয় পুরুষদের তুলনায় শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগ কম। সামান্য মজুরিতে শিশু শ্রমিকদের কাজে লাগানো হয়; বিশেষভাবে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে এরূপ শোষণ-ব্যবস্থা চূড়ান্ত রকমের। যেমন, মালয়ের রবার বাগানে সে দেশের মজুররা বৃটিশ মজুরদের গড়-পড়তা মজুরির পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র পান এবং একই ধরণের সমান কাজের জন্যে মেয়েরা পান পুরুষদের চেয়ে শতকরা ৩০ ভাগ কম মজুরি।

সোবিয়েৎদেশে প্রত্যেকে নিজস্ব প্রবণতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কাজ বেছে নিতে পারেন। পুজিবাদী দেশে তা হয় না। সেখানে নিরুপায় বেকার ইঞ্জি-নীয়ার হোটেলের পরিচারক বা মোটর ড্রাইভারের কাজ পেতে চান। মার্কিন মুলুকের কতকগুলি রাষ্ট্রে নিগ্রোরা মাত্র সবচেয়ে কম বেতনের কাজ পান। সম্মান-জনক কোনো পেশা বেছে নেওয়ার পথ তো নিগ্রোদের কাছে অবরুদ্ধ। ধনতান্ত্রিক সমাজে সংখ্যালঘু ধনীদের হাতে যত বেশি ঐশ্বর্য আসবে এবং তাঁরা যত বেশি বিলাসিতা করবেন, ততই জনসাধারণের দারিদ্র্য ও আর্থিক অনিশ্চয়তা বেড়ে যাবে। এ ক্ষেত্রেও আমরা সবচেয়ে বড় পুঁজিতান্ত্রিক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দেব। যুদ্ধের আমলে যে-দেশের ধনিক ও বনিক গোষ্ঠী ৫ হাজার ২শ কোটি ডলার মুনাফা লুটেছেন, যুদ্ধের পরে সেই মুনাফার পাহাড় আরো স্ফীতকায় হয়েছে। অথচ আমেরিকান শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি ও কেরানীদের বেতন হ্রাস পেয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান নেমে এসেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কংগ্রেসের কাছে তাঁর ভাষণে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, দেশের মোট জনসংখ্যার চার ভাগের তিন ভাগেরই উপার্জ্জন এত কম যে তা দিয়ে নিম্নতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা যায় না। অধিকন্তু খাদ্যদ্রব্য অগ্নি-মূল্য। বস্তিতে থাকেন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। অসুখ হলে ডাক্তার দেখাবার ক্ষমতা নেই বেশির ভাগ লোকের এবং বহু লক্ষ লোকের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যার্জ্জনে

সমগ্র ভারতীয় অর্থনীতি কয়েকটী কোটীপতির দ্বারা পরিচালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আসল শ্রেণীরূপ প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের বাস্তব ব্যবহারে। ব্যবহারই বিচারের কোষ্টিপাথর।

ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ

পুঁজির স্বাভাবিক ধর্ম্মই হচ্ছে কেন্দ্রীকরণ। ভারতবর্ষেও দ্রুতগতিতে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে। অনেক পণ্ডিতের ধারণা ভারতবর্ষ অর্থনীতির দিক হতে এখনও মধ্যযুগীয় অবস্থায় অবস্থান করছে; সুতরাং এখানে মূলশত্রু পুঁজিবাদ নয়; বরং পুঁজিবাদকে বাড়তে দেওয়াই হবে ঠিক কাজ। এ কথা মারাত্মক রকমে ভুল। ভারতীয় পুঁজি এখন আর দুর্ব্বল শিশু নয়; সে এখন একচেটে পুঁজিতে রূপ নিয়েছে। বিদেশী সবল লগ্নি পুঁজির এখন সে মিত্র। একচেটে পুঁজি শিশুও দুর্ব্বল পুঁজির পরিচায়ক নয়। পুঁজির কেন্দ্রীকরণ তার সবলতাই প্রমাণ করে। আর ভারতবর্ষে এই কেন্দ্রীকরণ যে কি চূড়ান্তভাবে রূপ নিচ্ছে তা কয়েকটা তথ্য বিবেচনা করলেই সমস্ত সন্দেহের নিরসন ঘটাবে।

ভারতবর্ষের সবচেয়ে সংগঠিত শিল্প হচ্ছে পাট শিল্প। বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে মোট চটকলের সংখ্যা ১১২টি। মিল গুলিতে তাঁতের সমগ্র সংখ্যা ৬৫,৩৮৬। বিদেশে প্রধানতঃ আমেরিকা, স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি সহরে, ফ্রান্সে ও ইতালীতে চটকল আছে এবং সেখানকার মোট তাঁতের সংখ্যা ৪৯,০০০। কিন্তু বিদেশের উৎপাদন ব্যয় বেশী হওয়ায় ভারতীয় চটকলগুলির পৃথিবীর বাজারে একচেটে কারবার। শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারে ভারতের চটকলগুলিতে মোট নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২০ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৫৩ টি মিলই ১৮ কোটি টাকা মূলধন শাসন করে এবং এই ৫৩টি মিল পরিচালিত হয় ১৭টি ম্যানেজিং এজেন্সি দ্বারা। তাদের মধ্যে আবার ৪টি এজেন্সি ৩০টি মিল পরিচালিত করে। তাহলে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল ৪টি ম্যানেজিং এজেন্সি ফার্ম মোট পাট শিল্পের শতকরা ২৭টী মিল এবং নিয়োজিত মূলধনের প্রায় শতকরা ৪৫ভাগ শাসন করে। এই দুটীর স্বার্থেই ভারতবর্ষের পাটশিল্প পরিচালিত হচ্ছে। এদের মধ্যে যেমন ম্যাকলিয়ড, জার্ডিন হেণ্ডারসন, জেমস ফিনলে, বার্ড, হিলজার্স, এণ্ড ইয়ুল, গিলিণ্ডার্স প্রভৃতি বিদেশী পুঁজিপতি চক্র আছে তেমন আছে বিড়লা, গোয়েঙ্কা, সুরযমল নাগরমল গোষ্ঠি। বর্ত্তমানে ভারতীয় গোষ্ঠিগুলি প্রথমোক্ত বিদেশী কোম্পানী গুলির প্রচুর শেয়ার কিনে অপ্রত্যক্ষভাবে পাট শিল্পের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগের ওপর খবরদারী করছে।

বস্ত্র শিল্পেও এই ব্যাপার। ১৯৩২ সালে ট্যারিফ বোর্ডের কাছে সাক্ষ্যদান কালে প্রমাণিত হয় একজন লোক ৬০টি মিলের ডিরেক্টর, দ্বিতীয় একজন ৪২টির এবং তৃতীয় জন ৩৪টির। ৩২টি ম্যানেজিং এজেন্সি ফার্ম মোট মিলের শতকরা ৬৭ ভাগ পরিচালিত করে। এই হিসাব যুদ্ধের বহু পূর্ব্বের মন্দার সময়ের। এর পর যুদ্ধের মরশুমে যে প্রচণ্ড লাভ হয়েছে এবং তারপরও কালোবাজারে যে কোটী কোটী টাকা মুনাফা লুঠেছে তার হিসাব পেলে দেখা যাবে যে বস্ত্র শিল্পে পুঁজির কেন্দ্রীকরণও পাট শিল্পের মত গোড়ে উঠেছে।

কয়লার খনিতেও তাই। এখানে মোট ২৭৭টি খনিতে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ হ'ল ১০ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৬০টিতে নিয়োজিত হয়েছে ৬ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ মোট মূলধনের শতকরা সাড়ে ৬২ ভাগ। ১৮টি ম্যানেজিং এজেন্সি কোম্পানী এই ৬০টি খনির পরিচালক। যদি আরও এগুনো যায় তাহলে দেখা যায় এই ১৮টির কোম্পানীর মধ্যে আবার ৪টি ৩১টি খনির মালিক। তাহলে হিসাব দাঁড়ায় ৪টি ট্রাষ্ট মোট মিলের শতকরা সাড়ে ১২ ভাগ এবং মোট মূলধনের শতকরা ৩৩ ভাগের মালিক।

চা শিল্পে ১১৭টি কোম্পানী শাসিত হচ্ছে ১৭টি এজেন্সি দ্বারা, এদের মধ্যে আবার পাঁচটি এজেন্সি ৭৪টি বাগানের কর্ত্তা। চিনি, সিমেণ্ট, লোহা ও ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পেই এই ভাবে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে। এই সব ধনপতিদের লাভের উদ্দেশ্যেই সমস্ত অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে।

জনকয়েক কোটী পতির কুক্ষিগত ভারতের গোটা অর্থনৈতিক জীবন

শুধু যে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ও ট্রাষ্টীকরণ তাই নয়; কয়েকটি গোষ্ঠিই সমস্ত অর্থনীতিটাকে চালিত করছে। আমেরিকায় যেমন ১১টি পরিবার সমগ্র আমেরিকার অর্থনীতিকে শাসন করে তেমনি কয়েকটি পরিবার ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এখানে বাইরের লোকের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ নই—প্রফেসার ওয়াদিয়ার মতে "This oligarchy in industry is a closed preserve. The son succeeds the father" এই সব গোষ্ঠির মধ্যে বিদেশী কোটীপতিরাও যেমন আছে, দেশীয় ব্যবসায়ীর দলও তেমনি আছে। নীচের তালিকায় দেখা যাবে বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সি ফার্মগুলি কেমন বিভিন্ন শিল্পের ওপর খবরদারী করছে।

এখন অবশ্য এই সব বিদেশী কোম্পানীগুলির মধ্যে ভারতীয় পুঁজিপতির দল ভালভাবে আসন গেড়ে বসে বিদেশী বণিকদের সহযোগিতায় দেশের জনসাধারণের বুকের রক্ত লুঠছে। দেশী ম্যানেজিং এজেন্সির মধ্যে নীচের গুলি প্রধান।

নাম	মোট পরিচালিত কোম্পানীর সংখ্যা
বিড়লা ব্রাদার্স	৬১
মার্টিন বার্ন	৪৪
জে, কে, ইণ্ডাষ্ট্রিজ	৪০
টাটা এণ্ড সন্স	২৫
করম চাঁদ থাপর ব্রস	২৩
ডালমিয়া জৈন	১৯

এই সব গোষ্ঠির বিভিন্ন ব্যবসায়ের হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছে যে এরা এক একজন বিভিন্ন ব্যবসায়ের চালক। যেমন ক'লকাতায় রেজেষ্ট্রীকৃত ৫৭টি পাটকলের ১৪৩ জন ডিরেক্টর ১২৩০টি ডিরেক্টরের পদ দখল করে আছে। এদের মধ্যে ৩০ জন ৮৭০টি পদের অধিকারী। এদেরই তাঁবে চলছে ১৫০টি চা কোম্পানী, ৬২টি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, ২৮টি লোহা ইস্পাত প্রতিষ্ঠান, ৭৫টি জীবন বীমা ও লগ্নি কারবার এবং ২৫টি ব্যাঙ্ক। ভারতবর্ষের ১০ জন লোক মোট ৩০০টি ডিরেক্টরের পদ অধিকার করে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্ত্তা হিসাবে কাজ করছে।

বিদেশী বণিকদের তুলনায় দেশী পুঁজিপতিরাও খুব বেশী দুর্ব্বল নয়

দেশী পুঁজি এখন আর শিশু ও দুর্ব্বল নয় বিদেশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আজ সে ভারতের বুকে এবং ভারতের বাইরে তার আসন করে নিতে চায়। ৩৪টি

নাম	মোট কোম্পানীর সংখ্যা	পাট	কয়লা	চা	বিদ্যুৎ ও ইঞ্জিনিয়ারিং	পরিবহন	চিনি	অন্যান্য
এনড্রু ইউল	৫৪	১০	১৪	১৮	—	৩	১	৮
ডানকান ব্রাদার্স	২৫	১	—	২৪	—	—	—	—
অক্টাভিয়াস স্টিল	২০	—	১	১৩	৫	১	—	—
বেগ ডানলপ	১৯	৪	—	১৩	১	—	১	—
বার্ড	২০	৮	৩	—	২	৫	—	২
গিলাণ্ডার্স আরবুথনট	১৭	২	৩	৫	—	৬	—	১
ম্যাকলিয়ড	১৭	৫	—	৬	—	৬	—	—
উইলিয়মসন ম্যাগর	১৭	—	১	১৬	—	—	—	—
সাওয়ালেস	১৬	—	৬	৭	—	—	—	৩
জার্ডিন স্কিনার	১৬	৪	৪	৬	—	—	—	২
কিলবার্ণ	১৫	—	৩	৯	২	১	—	—

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আর্থিক ক্ষমতাটুকুও নেই। ১৯৪৪ সালের তুলনায় অত্যাধিক সুদক্ষ মার্কিন শ্রমিকের আসল মজুরি ১৯৪৯ সালে শতকরা ২৮ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

সোভিয়েৎদেশে এ জাতীয় অবিচার চিরতরে লুপ্ত হয়েছে। স্তালিন শাসনতন্ত্রের ছত্রছায়ায় কাজ পাবার পবিত্র অধিকার ভোগী সোভিয়েৎ নরনারী তাঁদের দেশের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। ধন বৃদ্ধি হলে তবেই উন্নত হবে জনগণের জীবনযাত্রার মান। দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে যথাশক্তি কাজ করার মনোভাব গড়ে উঠেছে সোভিয়েৎ জনগণের মধ্যে।

মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি, খাদ্যদ্রব্য ও অপরাপর পণ্যের মূল্য হ্রাস, ক্রয় ক্ষমতার বৃদ্ধি ও সোভিয়েৎ রুব্‌ল-এর শক্তি বৃদ্ধির ফলে সোভিয়েৎ জনগণের জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। মজুরি ও বেতনভুক শ্রমিকদের আয় ১৯৪৯ সালে বেড়ে গেছে ১৯৪৮ সালের তুলনায় শতকরা ১২ ভাগ এবং ১৯৪০ সালের তুলনায় শতকরা ২৪ ভাগ বেশি।

বুর্জোয়া সমাজে শ্রম বা মেহনতের কাজ হয়ে আছে পীড়াদায়ক ও অমানুষিক বোঝা। 'সেই শ্রম সোভিয়েৎরাষ্ট্রে সম্মানের বিষয়, গৌরবের ব্যাপার, বীরত্ব ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের বিষয়বস্তু। টাস—

সম্পাদক শ্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পরিবেষক প্রেস ২৩ ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশি

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

একমাত্র সমাজতন্ত্রই মানুষের প্রকৃত মুক্তি আনতে পারে

বৃটিশ ট্রাষ্ট যেখানে সাড়ে ৭৫ কোটী টাকার ওপর খবরদারী করত সেখানে ৬টি দেশী ট্রাষ্ট সাড়ে ৩৭ কোটী টাকা শাসন করতো। এ অবস্থা ধীরে ধীরে বেড়েছে ভারতীয় একচেটে পুঁজি দেশীয় বাজার দখল করতে এগিয়ে গিয়েছে। ১৯৩৫ সালে ১৯টি বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি ৩৪৭টি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করত আর ২টি ভারতীয় এজেন্সি করত ২৭টি প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে একচেটে অগ্রগতিতে ভারতীয় পুঁজির অংশ হল শতকরা ৭ ভাগ। ১৯৪৬-৪৭ সালে এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। বৃটিশ এজেন্সির দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০১য়ে এবং ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিতদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৫টি। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় একচেটে পুঁজির অংশ হল শতকরা ২৭ ভাগ। এ ছাড়াও আর একটা উদাহরণ দিলে ভারতীয় পুঁজির শক্তি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষে বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় হল এনড্রু ইউল কোম্পানী। ৫৪টি প্রতিষ্ঠানের মারফৎ সে শাসন করছে ৭ কোটী টাকার মূলধন অথচ টাটা এণ্ড সন্স কেবল মাত্র ২২টি কোম্পানীর মারফৎ ৩০ কোটী টাকা অর্থাৎ এনড্রু ইউল কোম্পানীর সাড়ে চার গুণ বেশী মূলধন শাসন করছে। উপরোক্ত যে সাতটি দেশীয় ম্যানেজিং এজেন্সির নাম করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই এই অবস্থা।

ব্যাঙ্ক অর্থনীতির চালক

ভারতীয় পুঁজি এখন আর শুধু দেশের বাজার দখল করেই সন্তুষ্ট নয়; সে চায় বিদেশী বাজারেও আধিপত্য করতে। তাইতো জি, ডি, বিড়লা দাবী করেন "ভারতবর্ষের শুধু দেশীয় বাজার দখল করলে চলবে না, তাকে বিশ্বের বাজারও দখল করতে হবে। বিশেষতঃ জাপানের পরাজয়ের পর জাপানী বাজার আমাদের চাই।" একচেটে পুঁজির যুগে বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে শিল্পগুলির জোট বেঁধে ওঠে এবং কার্য্যতঃ ব্যাঙ্কগুলিই হয়ে ওঠে সমস্ত অর্থনৈতিক জীবনের পরিচালক। নীচের তালিকা তার স্বপক্ষে বলবে।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫
১কোটী টাকা এবং তদূর্দ্ধ	৩	৪	৪	৪	৬	৯	৯
৫০লাখ হতে ১কোটী টাকা	৩	৩	৩	৪	৭	১০	১৪

এইভাবে বড় বড় ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। যুদ্ধের পর ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলি যে উঠে গেল তাকে শুধু ধনতন্ত্রের সংকট বললে পুরা বলা হবে না। একচেটে পুঁজির আক্রমণও তাদের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম। একচেটে পুঁজির যুগে বড় বড় শিল্পপতিরা যেমন ব্যাঙ্কের মালিক হয় তেমনি ব্যাঙ্কের মালিক হয়ে তারা আরও বেশী করে দেশের অর্থনীতিকে নিজেদের খপ্পরে নিয়ে আসে। বড় বড় সাতটা ভারতীয় ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের ব্যবসায়ের পরিচয় নিলেই একথার যথার্থতার প্রমাণ হবে।

কোন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টররা	কয়টি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া	২২
ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া	২৬
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	৬৬
হিন্দুস্থান মারকেনটাইল ব্যাঙ্ক	৮১
ভারত ব্যাঙ্ক	৪৫
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	৯৪
হিন্দ ব্যাঙ্ক	২২

ভারতে বিদেশী পুঁজি

পুরনো পুঁজিবাদের যুগে, যখন প্রতিযোগিতার অবাধ স্বাধীনতা ছিল, তখনকার বৈশিষ্ট ছিল পণ্যের রপ্তানী। নবতম পুঁজিবাদের আমলে যখন একচেটে কারবারেরই রাজত্ব, তখনকার বৈশিষ্ট হল পুঁজির রপ্তানী। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় আমরা দেখি, এক নতুন ধরণের একচেটে কারবারের উদ্ভব হচ্ছে। প্রথমতঃ সব কটি অগ্রসর দেশে পুঁজিপতিদের একচেটে জোট; দ্বিতীয়তঃ কয়েকটি বিশেষ সমৃদ্ধদেশে বিরাট পুঁজি সঞ্চিত হওয়ায় তারাই একটা একচেটে জায়গা দখল করেছে। অগ্রসর দেশগুলিতে অপর্য্যাপ্ত উদ্বৃত্ত পুঁজি সঞ্চিত হয়েছে। .....যতদিন পুঁজিবাদ পুঁজিবাদই থাকবে ততদিন উদ্বৃত্ত পুঁজি কখনই জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার কাজে ব্যবহৃত হবে না। তার বদলে আরও মুনাফা লুঠবার জন্য এই পুঁজিকে বিদেশে, পিছিয়ে পড়া দেশে রপ্তানী করা হবে। এই সব পিছিয়ে পড়া দেশে মুনাফা হার সাধারণতঃ বেশী, জমির দাম এখানে অপেক্ষাকৃত কম, মজুরীর হারও কম, কাঁচা মালও সস্তা"। ভারতবর্ষেও এই কারণে বিদেশী পুঁজি এসেছে; ভারতবাসীর রক্ত শুষে সমুদ্রপারের কোটীপতিদের পকেট ভারী করেছে। পণ্যের আমদানী রপ্তানী থেকে যে লাভ হয় তার চেয়ে বহুগুণ লাভ হয় এই সব লগ্নি পুঁজি খাটিয়ে। একথার প্রমাণ মিলবে নীচের হিসাব থেকে।

বহির্ব্বাণিজ্য ও লগ্নি থেকে গেটবৃটেনের আয়

	১৮৯৯	১৯১২	১৯২৯	১৯৩২
	লাখ পাউণ্ড	লাখ পাউণ্ড	লাখ পাউণ্ড	লাখ পাউণ্ড
বহির্ব্বাণিজ্য থেকে আয়	১৮০	৩৩০	৫১০	২৮০
বিদেশে লগ্নি পুঁজি থেকে আয়	১০০০	১১৬০	২৫০০	১৪৫০

ভারতবর্ষে বিদেশী লগ্নি পুঁজির পরিমাণ যে কত তা আজ পর্য্যন্ত জানান হয় নি; এ সম্বন্ধে এক নীরব গোপনীয়তা রক্ষা করে চলা হচ্ছে। তবুও যতটুকু জানা গেছে তা থেকে একটা মোটামুটী ধারণা পাওয়া যায়।

বছর	ভারতে লগ্নি পুঁজির পরিমাণ	সংবাদের সূত্র
১৯০৯-১০	৩৬ কোটি ৫০ লাখ পাউণ্ড	স্যার জর্জ্জ পাইমা
১৯২০-২১	৪৮ „ ৭০ „ „	জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর রিপোর্ট
১৯২৪-২৫	৫৯ „ ৬০ „ „	„
১৯২৮-২৯	৭৩ „ ৩০ „	„
১৯৩৮-৩৯	৭৪ „ ১০ „ „	
১৯৪৫-৪৬	৭২ „ ৩৫ „ „	„

এ হিসাব সম্পূর্ণ নয়। কারণ কংগ্রেসী মার্কা স্বাধীনতা লাভের পর বিদেশী পুঁজিপতির দল নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে ব্যবসা চালাচ্ছে। এইসব সম্মিলিত সংহতি গুলি (Combinds) ভারতীয় বলেই চালান। ওপরে ছাপ ভারতবর্ষের কিন্তু মোটা লাভ বিদেশে চলে যাচ্ছে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। অশোক মোটরস লিঃ নামে এক মোটর গাড়ী আমদানী এবং সংযোজনার কারখানা খুলতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিলাতের অষ্টিন মোটর কোম্পানী এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতেই এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অষ্টিনের সাহেব এঞ্জিনিয়াররা শুধু যে এখানকার উৎপাদন কর্ত্তা তাই নয়, অষ্টিনের জনৈক কর্মাধ্যক্ষ ডিরেক্টর এবং স্বয়ং অষ্টিন কোং এর মোটা শেয়ার হোলডার।

এ ছাড়াও আর একটা কায়দায় বিদেশী পুঁজি ভারতবর্ষে ঘাঁটী গেড়ে বসেছে। তাদের বাহ্যিক চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই এটা বিদেশী কি দেশী। বিরাট বিরাট বিদেশী ট্রাষ্টের লেজুড় হিসাবে টাকার মূলধন নিয়ে ভারতবর্ষে বহু বিদেশী কোম্পানী সহযোগী প্রতিষ্ঠান খাড়া করছে। স্বদেশী চেহারা দেবার জন্য দু একজন ভারতবাসীকে ডিরেক্টর বোর্ডে স্থান দেওয়া, সামান্য কিছু শেয়ার ভারতবাসীর মধ্যে বিক্রী করা এবং নামের শেষে "ইণ্ডিয়া লিমিটেড" জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতা (?) পাবার আগে থেকে এ কারবারটি চলেছে এবং এখনও পুরোপুরি ভাবে

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

**নাম	অনুমোদিত মূলধন
গুড ইয়ার টায়ার এণ্ড রবার কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ	৩ কোটী টাকা
এসোসিয়েটেড ব্যাটারী মেকার্স (ইষ্টার্ণ) „	১ „ „
অসলার ইলেকট্রিকাল ল্যাম্প ম্যানুফ্যাকচারিং „	১ „ „
এফ এণ্ড সি অসলার (ইণ্ডিয়া) „	১ „ „
ব্রুকবণ্ড এষ্টেটস লিঃ	৭০ লাখ „
একসাইড ব্যাটারীজ (ইষ্টার্ণ) লিঃ	৩০ „ „
কোটস অফ ইণ্ডিয়া লিঃ	২০ „ „
স্যাংকি ইলেকট্রিকাল ষ্টাম্পিং	২০ „ „
বৃটিশ ড্রাগ হাউস (ইণ্ডিয়া) লিঃ	১৫ „ „
ড্রাগ প্রডাকটস কোং লিঃ	১৫ „ „
লিউইস এণ্ড টেলর (মহীশূর) লিঃ	১২ „ „
হেওয়ার্ড ষ্টিষ্টীলারী	১০ „ „
ক্যাডবেরী ফ্রাই (ইণ্ডিয়া) লিঃ	৫ „ „
টমাস ডবলিউ ওয়ার্ড (ইণ্ডিয়া) লিঃ	৫ „ „